"আবার আসিব ফিরে"

গৌতম কুমার পাল
প্রাক্তন ছাত্র
বর্তমানে অধ্যাপক, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যাণ্ড ইঞ্জিঃ বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

রাসবিহারী থেকে তারাতলার অটোতে উঠেছি। রাস্তায় প্রচণ্ড জ্যাম। দুর্গাপুর ব্রিজের উপর যানবাহনগুলো চলছে ধিকিধিকি করে। মনে মনে শাপ-শাপান্ত করছি কলকাতার ট্রাফিক ব্যবস্থাকে। হঠাৎ চোখ দুটো আটকে গেল হলুদ রঙের একটা চারতলা বাড়িতে। বি. পি. পোদ্দার হাসপাতালের ফাঁক দিয়ে বাড়িটা যেন মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করছে, "কী? চিনতে পারছ?" নিজের অজান্তেই বলে উঠলাম, "পারব না কেন?" আমাদের পুরনো স্কুল— নিউ আলিপুর বহুমুখী বিদ্যালয়, যেখানে শিশু শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত এগারো বছর পড়াশুনো করেছি। হঠাৎ চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে গেল। চারপাশ থেকে রাস্তা, গাড়ি, ঘরবাড়ি সব উবে গেল। এক অদৃশ্য টাইম মেশিন আমাকে পৌঁছে দিল স্কুলের মাঠটায়। সেদিন প্রথম কর্কের ডিউজ বলে ক্রিকেট খেলছি। ভয়ে ভয়ে ছিলাম, পাছে গায়ে লেগে যায় বল। ভয় কাটাতেই বোধহয় ঠিক করলাম, চোখ বুজে ব্যাট চালাব গায়ের জোরে! প্রথম বলে চার! পরের দুটো বলেই কভার ড্রাইভ, দুরান করে। আশে-পাশে বন্ধুরা "সাবাশ, দারুণ খেলছিস— চালিয়ে যা" এসব বলা শুরু করেছে। পরের বলেই বোল্ড! নিজের মনেই হেসে উঠলাম— আন্দাজে আর কতক্ষণ বলে ব্যাট লাগানো যায়।

অ্যাম্বুল্যান্সের আওয়াজে চমক ভাঙল। মন্ত্রমুগ্ধের মতো কখন যে অটো থেকে নেমে সত্যি সত্যি স্কুলের মাঠে এসে দাঁড়িয়েছি— খেয়াল করিনি। এই সেই মাঠ, যেখানে রোজ সকালে আমরা প্রার্থনা করতাম লাইনে দাঁড়িয়ে— কোনও দিন "আমরা করব জয়," কোনওদিন "ধন-ধান্যে পুষ্প-ভরা," কোনওদিন "তুমি নির্মল কর মঙ্গল করে।" ওই তো ওখানে দাঁড়িয়ে তপতীদি পি.টি. করাতেন— "এক-দুই-তিন-চার।" মাঠের পাঁচিলে এখানে-সেখানে এখনও চক দিয়ে আঁকা উইকেটের দাগ; কিছু বেশ পুরনো, হয়ত আমাদের তৈরী করা, কিছু একেবারে টাটকা। পেছনে তাকিয়ে দেখি রামস্বরূপ এসে দাঁড়িয়েছে কখন। স্কুলের পুরনো দারোয়ান; "তুমি এখনও এখানে কাজ কর? সেই একই রকম দেখতে আছো কিন্তু..." মুখের দিকে তাকিয়ে চিনতে পেরে হাসল। তারপর আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল পাশ দিয়ে। টিফিনের সময় আমরা যখন বন্ধ গেট-টা বেয়ে অর্ধেক উঠে হাত বাড়িয়ে আলু-কাবলি কিনতাম, তখন রামুদাই আমাদের সামলাত, পাছে পুরো গেট টপকে কেউ বাইরে না বেরিয়ে যায়, বা কেউ পড়ে না যায়। মাঠটা একচক্কর ঘুরে কোলাপসিবল গেটটার কাছে গিয়ে দেখি সেটা খোলা রয়েছে। কে জানে, হয়ত রামুদাই খুলে দিয়েছে আমাকে দেখে। পায়ে পায়ে আমাদের ক্লাসরুমে ঢুকলাম। এক-একটা বছর এক-একটা রুমে ক্লাস হত— তাই প্রত্যেকটাতেই জমে আছে স্মৃতির পাহাড়। নতুন রঙের ছোঁয়া পারেনি বাতাসে সেই মেদুর স্মৃতির গন্ধ মুছে ফেলতে। মনে পড়ছে বুলবুলদি, গীতাদি, প্রতিমাদি, ছন্দাদি— সবার কথা। মনে পড়ছে, আমি কথায় কথায় হাসতাম বলে নন্দিতাদি একবার খুব ধমক দিয়ে বলেছিলেন, সারাজীবন যেন এরকমই হেসে যেতে পারি! ওঁদের মাতৃসম স্নেহে শাসন, আশীর্বাদ সবই একাকার হয়ে যেত। মনে পড়ছে রণেনবাবুর

কথা, যার গলা সবচেয়ে আস্তে ছিল, অথচ ক্লাসে তাঁর গলা সবচেয়ে জোরে শোনা যেত। চরমতম বিচ্ছু ছেলেরাও তাঁর ক্লাসে পিন-ড্রপ সাইল্যান্স বজায় রাখত, এমনই একটা অদ্ভুত জ্যোতি ছিল তাঁর ছিপছিপে চেহারায়, কাঁধে ঝোলা ব্যাগ নিয়ে তাঁর ধীরে ধীরে হেঁটে যাওয়ায়। মনে পড়ছে গীতাদেববাবুর কথা, যাঁর পড়ানোর গুণে সংস্কৃতকে মনে হত অঙ্কের মতো সোজা।

করিডোর-গুলো ঠিক একই রকম রয়েছে। টিফিনের সময়, ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে আমরা সেখানে ছুটোছুটি-হুটোপুটি করে বেড়াতাম। সিঁড়ির একটা ল্যাণ্ডিং থেকে আর একটা ল্যাণ্ডিং খুব একটা বেশী উঁচুতে ছিল না। আমাদের মধ্যে কম্পিটিশন চলত কে কত উঁচু থেকে লাফ মারতে পারে। চারতলার হলঘরটাও খোলা রয়েছে, যেখানে শারীরশিক্ষার ক্লাস হত। পিছন-দিকের ডিগবাজিটা ভালই দিতে পারতাম। কিন্তু সামনের দিকেরটা একদম দিতে পারতাম না — ভয় লাগত যে ঘাড় মটকে যাবে!

পকেটে মোবাইলের রিং-এ টনক নড়ল— দেরি হয়ে যাচ্ছে গন্তব্যে যেতে। অনেকদিনের মন-কেমন করা ধুলো গায়ে মেখে নিচে নেমে এলাম। সারি সারি পাম গাছগুলো মাথা দুলিয়ে টা-টা করতে করতে বলল— "আবার এসো।"